BARISHAL UNIVERSITY JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES Vol.-5, Issue-2, June 2024, 209-228

সাতক্ষীরার কর্তাভজা সম্প্রদায় : ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবনাচার

ইদ্রিস আলী[১] ও সুরাইয়া আক্তার[২]

Abstract: Various religions emerged in Bengal and the entire Indian subcontinent. But the local people have adopted these religions for the needs of life and have adapted those religions to their own way of life. Only when the traditional Bengali culture and way of life were interrupted did new customs emerge. Therefore, it can be seen that any religion has basically been combined in Bengal. Humanism, generosity and non-violence have been combined in religions over the ages. Kartabhaja community is a religious community that embodies the traditional characteristics of Bengal by giving priority to people, giving priority to truth instead of caste, caste system and discrimination. The Kartabhaja community of Bengal still practices all forms of sectarianism and non-violence, which is undoubtedly an example for the followers of other religious traditions.

Keywords: Kartabhaja, Folk community, Religion, Satkhira, Lifestyle.

ভূমিকা

অষ্টাদশ শতকের জাতিভেদ, বর্ণপ্রথা ও সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজে অবস্থান নেওয়া একটি সম্প্রদায় কর্তাভজা ধর্মের অনুসারী ভগবানিয়া। বাহ্মণ সৃষ্ট বর্ণ-বৈষম্য, বাঙালি সংস্কৃতির মাঝে সুফি চেতনার পুরোপুরি খাপ খাওয়ানোর ব্যর্থতা, নিপীড়নের শিকার সাধারণ মানুষের ব্রাহ্মণ্যবাদে আচ্ছাদিত বৈষ্ণব ধর্মে অনাগ্রহ-এমনই এক ধর্মীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটে কর্তাভাজা নামে এক সামাজিক আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। ভারত ও বাংলাদেশের ধর্মসংস্কার আন্দোলনে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার গণতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ, ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও জাত-পাতের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া এই সম্প্রদায়ের অসাম্প্রদায়িক চেতনা খুব দ্রুতই সমাজের বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলে। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুসারীদের বিভিন্ন গীতে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি, বৈষম্য ফুটে ওঠে নিপুনভাবে। নবজাতকের নামকরণে হিন্দু মুসলমান সব ধর্মের নাম রাখার প্রবণতার মধ্য দিয়ে এই সম্প্রদায়ের ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতীয়মান হয়। আবার মৃতের সৎকারে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে কবর দেওয়ার পাশাপাশি শ্মশানে দাহ করার নজিরও পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় বিশ্বাসে ব্যতিক্রমী নীতিমালার পাশাপাশি লোকায়ত স্বাস্থ্য পরিচর্যার সাথে এই ধর্ম সম্প্রদায়ের একটি যোগসূত্র রয়েছে। ধর্মের প্রচলিত বিধানচ্যুত হলেই অনুসারীরা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় বলেই তাদের বিশ্বাস। নতুন নতুন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া আধুনিক ঔষধপত্র গ্রহণের ফল বলে মনে করেন এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাসীরা। আধুনিক ঔষধ ব্যবহারের

---

[১] প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরা, বাংলাদেশ

[২] সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

CamScanner

পরিবর্তে তাই ভেষজ ও গৃহস্থালী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উত্তম মনে করেন তারা। আমাদের ধারণা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে জর্জরিত বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস এক ধরণের স্বস্তির বাতায়ন তৈরি করতে পারে। অথচ এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত। এ সম্পর্কে কিছু বিক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া গেলেও বস্তুনিষ্ঠ কোনো বিবরণ বা গবেষণা কর্ম লক্ষ করা যায়না। এ বিবেচনা থেকেই আমরা বর্তমান গবেষণা কাজে অগ্রসর হয়েছি। গবেষণাটি মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য এবং দ্বৈতয়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে।

বসবাসরত এলাকা: সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার কাশিয়াডাঙ্গা, চরগ্রাম, লাউতাড়া, বারইপাড়া, আশাশুনি উপজেলার শোভনালী, কেচোডুবিয়া, বড়দল; কলারোয়া উপজেলার বোয়ালিয়া, রায়পুর, কুশুডাঙ্গা, একড়া ও সাতক্ষীরা জেলা সদরে এই সম্প্রদায়ীদের বসবাস রয়েছে। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার বেতগ্রাম, ঘোষড়া ও যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার জগলান্দ কাটি গ্রামে ভগবানিয়াদের বসবাস রয়েছে।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের পরিচিতি

কর্তাভজা সম্প্রদায় লোক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। লোক সম্প্রদায় হল পৃথক পৃথক ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী এবং বিশেষ বিশেষ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে, রীতি-নীতি পালনে অভ্যস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের ৪টি প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী- মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধের পাশাপাশি এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী বহুদিন যাবত বাংলাদেশে বসবাস করে আসছে। লোক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনাচরণ, কৃষ্টি, রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো থেকে ভিন্নতর। গবেষণায় দেখা যায় মূল ধর্ম থেকেই এদের উদ্ভব। কিন্তু, মূল ধর্ম বা শাস্ত্রের রীতি-প্রথা অনুসরণ না করেই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবনাচারণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকে এসব উপসম্প্রদায়ের মানুষেরা (ইসলাম, ২০১১, পৃ. ৩৬৪)। তবে উৎপত্তি ও অবস্থানগত দিক বিবেচনায় দেখা যায় যে, লোক সম্প্রদায়গুলি পৃথক পৃথক সময় ও স্থানে আবির্ভাব হয়। এই সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে কোনো কোনোটা উৎসভূমির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও কোনো কোনো সম্প্রদায় উৎসভূমির সীমা অতিক্রম করে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার সুদূর অতীতে কোনো সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হলেও কালের সীমা অতিক্রম করে সেগুলো বর্তমানেও বিরাজমান রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে এমন কিছু লোক সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্তাভজা, কিশোরীভজন, জগোমোহিনী, ন্যাড়া, বলাহাড়ি, বাউল, মতুয়া, সাহেবধনী, বাঙালি অন্যতম (ইসলাম, ২০১১, পৃ. ৩৬৪)।

কর্তাভজা সম্প্রদায় মূলত বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের আলোচনার বিষয়। এই সম্প্রদায়ের অনুসারীদের ভববেনে নামেও ডাকা হয়। ভগবানের উপরে অটল বিশ্বাস থাকার কারণে এই নামে ডাকা হয়। বেনে শব্দটি দিয়ে কারিগরকে বোঝানো হয়। এখানে এই কারিগর মূলত মানুষ গড়ার কারিগর। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলাকে এ সম্প্রদায়ের উৎসভূমি হিসেবে মনে করা হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর চব্বিশ পরগণা, বীরভূম, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, পুর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা ও মধ্যপ্রাচ্যে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, মাগুরা, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, সিলেট ও বিক্রমপুর অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে (সূত্রধর, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫)। সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার গোয়ালডাঙ্গা, শোভনালী, কচুয়া, কাঁদাকাটি, হাবাসপুর, কেঁচোডুবিয়া, বড়দল, শ্যামনগর উপজেলার জাওয়াখালী, বেতাঙ্গী, বসুখালী, ভেটখালী, সাতক্ষীরা সদরের রামেরডাঙ্গা, মাগুরা, রায়পুর, কলারোয়া উপজেলার বোয়ালিয়া, কুশোডাঙ্গা, জুগিখালী, মীরডাঙ্গা,

CamScanner

জলালাবাদ, তালা উপজেলার কাশিয়াডাঙ্গা, চরগ্রাম, লাউতাড়া, বারইপাড়া প্রভৃতি গ্রামে এই সম্প্রদায়ের বসতি রয়েছে (কিনুলাল, সাক্ষাতকার, ১৬ আগস্ট ২০১৭)।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বাংলাদেশে বিস্তার

বাংলায় চৈতন্য পরবর্তীকালে কিছু ছোট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তি দেখা যায়। আউল, বাউল, শাহী, দরবেশ, কর্তাভজা ও সহজিয়া হলো এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান শাখা। কর্তাভজা আঠারো শতকে বৈষ্ণববাদ ও সুফিবাদ থেকে উদ্ভূত একটি ক্ষুদ্র ধর্মীয় সম্প্রদায়। আউল মহাপ্রভুকে বলতেন কর্তা, ঈশ্বর বা খোদা নয়। সঙ্গীত ছিল তাঁর সাধনার প্রধান মাধ্যম। তিনি অনুসারীদের কর্তার উপাসনা করতে বলতেন। তৎকালীন লোকমুখে তাই এ সম্প্রদায়কে কর্তাভজা বলা হতো। কর্তাভজা সম্প্রদায় কলকাতা, চব্বিশ পরগনা, সুন্দরবন ও সিলেট অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এ মতের অনুসারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জয়নারায়ণ ঘোষাল, কবিয়াল আন্দিরাম কানাই ঘোষ, কৃষ্ণ দাস, নিধিরাম ঘোষ, মনোহর দাস। এই মতবাদটি আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের শুরুর দিকে জনপ্রিয় ছিল। বিশ শতকের শুরুতে হিন্দু ও মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলনের ফলে দূর্বল হয়ে যায় (ইসলাম, ২০১১, পৃ. ৩৬৫)। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তির মূলে রয়েছে বর্ণবৈষম্য ও আন্তঃধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। ভারতীয় উপমহাদেশে বহুদিন থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদ সমাজের উপর জেঁকে বসে তা মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভাজিত করছিল। এই শ্রেণি বিভাজনের কারণে অন্ত্যজ শ্রেণিকে গভীর সামাজিক মানসিক টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয় (বেনজিন, ২০১৯ ,পৃ. ১৫)। যেমন হরিচাদ ঠাকুর উদ্ভাবিত মতুয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ শ্রী শ্রী হরি লীলামৃতে বলেছেন, "সাপের বিষ থাকে দুটি দাঁতে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদের বিষ থাকে প্রতিটি লোমকূপে। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদকে পুড়িয়ে হত্যা ছাড়া অন্ত্যজের মুক্তি নেই।" সুতরাং বিষয় এখানে পরিষ্কার যে, বর্ণবৈষম্য বা জাতিবর্ণ প্রথার কারণে অন্ত্যজ হিন্দুদের নিজেদের অবস্থান সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং তা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। অস্পৃশ্যতার অজুহাত দিয়ে ব্রাহ্মণ সমাজ যে বৈষম্যের পরিস্থিতি তৈরী করেছিল সে অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে মানব সমাজে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সূত্রপাত ঘটে (ঠাকুর, ২০০৫ ,পৃ.৩২)।

সতীশচন্দ্র মিত্র তার যশোহর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখেছেন: "ভগবানিয়া এক অদ্ভুত জাতি। ইহারা মূলতঃ মুসলমান, পরে ঘোষপাড়ার 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছেন। ইহারা এক 'গুরু সত্য' জাতীয় মন্ত্র সকলে পান, পৃথক পৃথক বীজ মন্ত্র নাই। ইঁহাদের মন্দির বা মসজিদ নাই, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস নাই ; উপাসনার কোন সময়, স্থান বা প্রকার নাই। ইঁহারা মৃত ব্যক্তির শব মন্ত্রপূত করিয়া মুসলমানের মত কবর দেন। মাংস মোটেই খান না, উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করেন না। মৎস্য সকলে খান; আহারে হিন্দুর মত শুদ্ধাচারী এবং সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন। গলায় মালা ধারণ বা বস্ত্র পরিধানের কোন নিয়ম নাই। দাড়ি রাখা বা না রাখা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। ইহারা একমাত্র নিরাকার ভগবানে বিশ্বাস করেন। এজন্য ইহাদের নাম ভগবানিয়া, কিন্তু ইঁহারা জাতিতে মুসলমান বলিয়া লিখিত ও কথিত হন এবং সেলাম দেন" (মিত্র, ২০০১ পৃ. ১৩৫)। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের এছাড়া আরো কিছু নাম প্রচলিত রয়েছে। যেমন- আউলিয়া ধর্ম, সতীমাতার ধর্ম, ঘোষ পাড়ার ধর্ম, সত্য ধর্ম, সনাতন ধর্ম, সহজ ধর্ম। এ সম্প্রদায়ের আরো কতগুলো উপধারা রয়েছে। যেমন- ভগবজ্জন, ভগবানিয়া, সাহবে ধনী, রামবল্লভী, সত্য স্রোত, বিত্তিহুদা প্রভৃতি (সরদার, ২০১৩, এপ্রিল ১২)।

CamScanner

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিষয়ে নানা রকম কিংবদন্তী চালু আছে। এর মধ্যে সব থেকে প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য কিংবদন্তীতে আউল চাঁদকে এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ হিসেবে মনে করা হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা আউল চাঁদকে স্বয়ং ঈশ্বর অবতার বলে থাকেন। তাদের দৃষ্টিতে শচীনন্দন শ্রী চৈতন্যদেব শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের অঙ্গে অপ্রকট হয়ে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সকলের অগোচরে পশ্চিমবঙ্গের আলোরপুর পরগণার খোলাদুবলী উৎপলী গ্রামে বহুদিন অবস্থান করেন। পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার উলা গ্রামে কোনো এক শুক্রবারে মহাদেব নামে কোনো এক বারুইয়ের পানের বরজে আট বছরের বালকরূপে কর্তাভজা ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আউল চাঁদ দেখা দেন (বেনজিন, ২০১৯, পৃ.৩২)। বারুই মহাদেবের কোনো সন্তানাদি না থাকায় তিনি কুড়িয়ে পাওয়া অপরিচিত বালককে ঘরে নিয়ে লালন-পালন করতে থাকেন। আউল চাঁদ সেখানে তার ২৭ বছর বয়স পর্যন্ত অতিবাহিত করে নদীয়া জেলার বারাকপুর মহাকুমার ত্রিবেণীঘাট সংলগ্ন বেজরা গ্রামে হাজির হন। এখানেই তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করলে সদগোপ বংশীয় রামসরণপাল, কানাইঘোষ, হুটু ঘোষ সহ ২২ জন ব্যক্তিকে তিনি দীক্ষা দেন (নন্দী, ১৯৭৯, পৃ. ৫৩)। শিষ্যগণের নাম ও তাদের বংশ পদবী-ঘোষ, দাস, কাঁসারি, রজপুত, রুইদাস প্রভৃতি দেখে একটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে, এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে সমাজের অবহেলিত অন্ত্যজ শ্রেণির মধ্য থেকে। কর্তাভজার মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, সব মানবই এক ঈশ্বরের সন্তান আর প্রত্যেকেই একে অপরের ভাই। তাই তারা মানুষের মাঝে ছোট, বড়, জাত-পাত, বৈষম্য স্বীকার করেনা (বেনজিন, ২০১৯, পৃ.৩৩)।

বর্ণ ও জাত বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্ভাসিত কর্তাভজা ধর্ম ধীরে ধীরে অন্ত্যজ মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থেকে। সাথে সাথে আউল চাঁদের খ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এভাবে দীর্ঘ দিন এই ধর্মমত প্রচার করে ১৭৬৯ সালে বর্তমান বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলায় কলারোয়া উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামে তিনি দেহরক্ষা করেন। এই বোয়ালিয়াতেই আউল চাঁদের কাঁথার সমাধি দেওয়া হলেও চাকদহের তিন ক্রোশ পূর্ববর্তি পরারী গ্রামে তার দেহের সমাধিস্থ করা হয় (বেনজিন, ২০১৯, পৃ.৩৩)। অন্য আরেকটি কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, কোনো এক স্থানে একটি গরু মারা গেলে রামসরণ পাল ও কানাইঘোষ চিন্তিত অবস্থায় একত্রে বসে আলোচনা করছিল। ঠিক এসময় আলুথালু বেশে এক ফকিরের অবির্ভাব হয় সেখানে। ফকিরের কেরামতিতে মৃত গরু জীবিত হলে রামসরণ পাল তার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ জাত-পাত বিরোধী অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী কর্তাভজা ধর্মে দীক্ষিত হন (নন্দী, ১৯৭৯, পৃ.৫৪)। এছাড়া বলা হয় তালা উপজেলার চর গ্রামে প্রায় ৪০টি ভগবানিয়া পরিবারের বসবাস এবং তাদের মহল্লাটি একটি ধাম হিসেবে পরিগণিত। এই গ্রামের প্রথম অনুসারী ছিলেন আশা মাহমুদ (মুকুল, জানুয়ারি ২০১৫)। কথিত আছে, আশা মাহমুদ একসময় কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। কালিপ্রসন্ন কপত নামের এক হিন্দু ভদ্রলোকের পরামর্শে তিনি যশোরের জগলান্দকাটি গ্রামের শিবরাম মোহন্তের শরণাপন্ন হন। সেখানে একধরনের বিশেষ ঝালের তরকারি খেয়ে আশা মাহমুদ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান এবং ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারী হয়ে নিজ গ্রামে চলে আসেন।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রথম দীক্ষীত ব্যক্তির নাম রামসরণ পাল। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার জগদীশপুর গ্রামে। তাঁর পেশা ছিল কৃষি। তিনি আউল চাঁদ কর্তৃক কর্তাবাবা উপাধিতে ভূষিত হন। রামসরণ পালের পুত্র দুলাল চাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রচারক এবং তাদের আইন

CamScanner

পুস্তক ভাবের গীতের রচয়িতা। তার মায়ের নাম স্বরস্বতী দেবী। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি বাবাকে হারান। তার সম্পর্কে হান্টার বলেন, "Ramdulal from his youth showed signs of his future carrier." গ্যারেট সম্পাদিত ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ারে বলা আছে- "He appears to have been a man of marked personality and considerable power of proselytism. He impressed a number of leading men of his with his teaching and very largely to the numbers of the sect by the time of his death which took place in 1833". (সরদার, ২০১৩, এপ্রিল ১২)।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রচার ও প্রসারে আউল চাঁদের নেতৃত্বে রামসরণ পাল, তার সহধর্মীনি সরস্বতী এবং আরও ২২ জন দীক্ষিত ফকির নিরলস ভাবে কাজ করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কাজ শুরু হয় শুক্রবারে। কর্তাভজা প্রবর্তক আউল চাঁদের আবির্ভাব দিবসও শুক্রবার। একারণে দিনটি এ সম্প্রদায়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ভাষায় শুক্রবারে সৃষ্টির উৎপত্তি হওয়ায় এদিনে তারা মাছ খায় না। প্রকাশ থাকে যে ডিম, মাংস খাওয়া তাদের সম্প্রদায়ে নিষেধ। তবে এই বাইশ জনের বাইরে আরও কয়েক জনের নাম প্রখ্যাত হিসেবে জানা যায়। এরা হলেন নফর বিশ্বাস, সরাফ মোল্লা এবং শিব রাম মহন্ত। নফর বিশ্বাসের বাড়ি সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানার বোয়ালিয়া গ্রামে। এইখানে আউল চাঁদ ফকিরের কাঁথার সমাধি আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় আউল চাঁদ ফকির ছিলেন জটাধারী এবং তিনি কাঁথা পরিধান করতেন। উল্লেখ্য এ বিষয়ে অনেক বিতর্কও আছে। কারও কারও মতে পশ্চিম বঙ্গের শাকদহ সংলগ্ন বোয়ালিয়াতেই আউল চাঁদ ফকিরের কাঁথার সমাধি আছে। তবে একথা ঠিক যে নফর বিশ্বাস পরবর্তীতে আউল চাঁদের অনুকরণে ফকির উপাধি লাভ করেন। আর সেই থেকে তারা অর্থাৎ তার বংশ ধর ফকির উপাধিতে ভূষিত হয় এবং তার বাড়ি সংলগ্ন চার রাস্তার মোড়টি ফকির পাড়ার মোড় হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে এবং সেখানে একটি বাজারও গড়ে উঠেছে (সরদার, ২০১৩, এপ্রিল ১২)।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস

নতুন ধর্মমতের অনুসারী 'ভগবেনে' সম্প্রদায় তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর নাম মুসলমানদের মতো। মুখে দাঁড়ি রাখে। মাছ খায়, মাংস খায় না, অসুখে কিছু ওষুধ পথ্য ব্যবহার করে। অপর শ্রেণী হিন্দু ভাবাপন্ন। এদের নাম হিন্দুদের মতো। মাছ-মাংষ, ওষুধ-পথ্য কিছুই খায় না। অসুখে উপোস করে, অনেকে মাটিকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে। কর্তাভজা সম্প্রদায় সমন্বয়বাদী চেতনা লালন করে। ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পরে হিন্দু এবং মুসলমানের দ্বন্দ্ব চরম রূপ লাভ করে। এর মূল কারণ রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মের বর্ণবাদী অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে অন্ত্যজ হিন্দু জনগোষ্ঠী যারা অত্যাচারিত তারা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। এ অবস্থায় রক্ষণশীল প্রভাবশালী হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজ সেটি মেনে নেয়নি। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সুফি চেতনায় প্রভাবিত হয়ে শ্রী চৈতন্য বৈষ্ণব আন্দোলনের সূত্রপাত করলেও ব্রাহ্মণ থেকে বেড়িয়ে আসতে ব্যর্থ হওয়ায় সর্বাঙ্গীন সফলতা পায়নি। এ অবস্থায় কর্তাভজার মত অসংখ্য লোকসম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে। ফকির আউল চাঁদের নেতৃত্বে কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, কৃষক, মুচী, হিন্দু, মুসলমান, মগ, ফিরিঙ্গী, ওলন্দাজ ও ব্রাহ্মণসহ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সকলের প্রবেশাধিকার সমান (সরদার, ২০১৩, এপ্রিল ১২) কর্তাভজা সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো গুরুদেবের পুত্র অযোগ্য হলে তারা তাকে গুরু নির্বাচন করে না। তাদের ভাবের আইনে বলা আছে যে সাধন ভজন সম্পর্কে প্রাপ্ত জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিই গুরুদেব হবার অধিকারী। এর মাধ্যমে বর্ণবাদ ও ব্রাহ্মণ থেকে মূলত তারা বের হয়ে আসতে পেরেছে (সরদার, ২০১৩, এপ্রিল ১২)।

CS CamScanner

ধর্মীয় আজ্ঞা

প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মত উপধর্মীয় সম্প্রদায়েরও কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস রীতি-প্রথা-পদ্ধতি থাকে। কর্তাভজাও তার ব্যতিক্রম নয়। এ ধর্মে নিরাকার একেশ্বরে বিশ্বাসী। মুর্তি বা সাকার পুজা এরা করেনা। এ ধর্ম অনুসারীরা পূনর্জন্মে বিশ্বাসি। ধর্ম অনুসারীরা গুরুবাক্য মেনে চলে। প্রথম কথা-ই হচ্ছে- গুরু সত্য, গুরুর বাক্য সত্য। এই ধর্ম সহজে কেউ গ্রহণ করতে পারেনা। অন্য ধর্মের কেউ কর্তাভজা ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তাকে ৬টি আজ্ঞা পালন করতে দিয়ে তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। মূল ৬টি আজ্ঞা থেকে পরবর্তীতে ৩০ টি আজ্ঞা হয়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আজ্ঞা হল- কর্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত পিতা-মাতার গর্ভে জন্ম হলে সে একজন কর্তাভজা। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সমাজব্যবস্থায় নববধুর বিবাহের পূর্বে সত্য নামে দীক্ষা গ্রহণ না করে থাকলে বিবাহের পরে সত্য নামে দীক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। দীক্ষা প্রদানকারী মহাশয় ও দীক্ষা গ্রহণকারী বরাতি উভয়ে পবিত্র হয়ে উপাসনা করে বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্বে দীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সুসম্পন্ন করবে। দীক্ষা গ্রহণ করে গুরুদেবকে যথাসম্ভব দক্ষিণা দান করবে। কর্তাভজা সত্যধর্মে শিক্ষাগুরু বা দীক্ষা গুরু মূলত একইজন (ওয়াজেদ মণ্ডল, সাক্ষাৎকার, ১৪ আগস্ট ২০১৭)। কর্তাভজা সত্য ধর্ম পালন করতে হলে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক বা দেহ, মন ও বাক্য-এই তিনটি বিষয়েই অবশ্যই সংযত হতে হবে। কায়িক হচ্ছে-দেহ দ্বারা কার কোনো ক্ষতি বা কোনো হিংসা না করা। মানসিক হচ্ছে- একে অপরের বিরুদ্ধে শঠতা, চাতুরি ও কুমন্ত্রণা থেকে বিরত থাকা। মনে মনে কখনো অহংকার না করা। আর কারো অমঙ্গল বা অনিষ্ঠ চিন্তা না করা। বাচনিক হচ্ছে- সত্য পথাশ্রিত ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলা। মিথ্যা ভাষণ, পরনিন্দা ও অপ্রয়োজনীয় বাক্য ব্যবহার থেকে সর্বদা বিরত থাকা। সত্য মতাশ্রিত কোনো ব্যক্তি পরস্ত্রী বা পর পুরুষের সাথে হাসি-ঠাট্টা, উপহাস ও ধর্মীয় বাক্য বহির্ভূত কোনো বাক্যালাপ করবেনা। সত্য মতাশ্রিত একজন ভক্ত ব্যভিচার দোষ থেকে নিজেকে সর্বদাই মুক্ত রাখবে (অজিত খাঁ, সাক্ষাতকার, ১৫ আগস্ট ২০১৭)।

সত্য ধর্ম হিসেবে বিশ্বাস

কর্তাভজারা নিজেদেরকে 'সত্য ধর্ম'-এর অনুসারী হিসেবে দাবি করেন। এই কারণে সত্য কথা বলা তাদের ধর্মের মূলমন্ত্র। আবার এরা সত্যকে পরমাত্মার অপর নাম হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। এরা নিজেদের ভিতর পরমাত্মার অস্তিত্ব অনুভব করেন। তারা বৌদ্ধ ধর্মের মত বিশ্বাস করেন যে, পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলনে নির্বাণ লাভ হয়। এই নির্বাণের মধ্য দিয়ে তারা পরমাত্মা বা পরমস্রষ্টার অংশভাগী হয়ে যান। কখনো কখনো নিজেদের ভিতর পরমস্রষ্টাকে অনুভব করেন। সুফিবাদের 'আনাল হক' তথ্য 'আমিই খোদা' মনে করেন। তারা শুক্রবারকে ধর্ম পালনের দিন হিসেবে মনে করেন এবং পাঁচবার স্রষ্টার নাম জপ করেন। আচারের দিক থেকে ইসলামি রীতি অনুসরণ করেন। সব মিলিয়ে তাদের মত মূলত বৈষ্ণব, বৌদ্ধ এবং সুফি দর্শনের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। তাদের গুরুকে বলা হয় 'মহাশয়' আর শিষ্যদের বলা হয় 'বরাতি'। মহাশয় বরাতিদের দীক্ষা দেন। এছাড়া শাস্ত্রপন্থী কাজ হিসেবে সম্প্রদায়ের সদস্যদের আরো দশ আজ্ঞা বা হুকুম পালন করতে হয়।

১। সদা সত্য কথা বলা ২। হিংসা না করা ৩। চুরি না করা ৪। ডিম মাংস না খাওয়া। ৫। উচ্ছিষ্ট না খাওয়া। ৬। কখনো মিথ্যা কথা না বলা ৭। পরস্ত্রী বা পরপুরুষে আসক্তি না হওয়া। ৮। মাদক দ্রব্য বর্জন করা। ৯। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তামাক সেবন না করা। ১০। পিতা-মাতা, গুরুজন ও

প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রাখা। (সাগর হোসেন, সাক্ষাৎকার, ১৬ আগস্ট ২০১৭)। অন্যভাবে বলা যায়-

১) কায় কর্ম (৩ প্রকার): পরস্ত্রীগমন, পরদব্যহরণ এবং পর হত্যাকরণ
২) মনঃকর্ম (৩ প্রকার): পরস্ত্রীগমনের ইচ্ছা, পরদব্যহরণের ইচ্ছা এবং পর হত্যাকরণের ইচ্ছা
৩) বাক্যকর্ম (৪ প্রকার): মিথ্যা কথন, কটু কথন, অনর্থক বচন ও প্রলাপ বচন।

গুরুকেন্দ্রিক

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পারলৌকিক ক্রিয়া, বিবাহ, অন্নপ্রাশন ও মাঙ্গলিক কাজ অবশ্যই গুরুদেবের উপস্থিতিতে অথবা গুরুদেবের সম্মতিতে যেকোনো নিষ্ঠাবান ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করা (আরিজুল্লাহ শেখ, সাক্ষাৎকার, ১৬ আগস্ট ২০১৭)। গুরু ছাড়া তারা অন্য কারো উপাসনা করেন না। গুরুর গৃহই ভক্তের মন্দির। এই গুরু আবার একটি পরিবারে একাধিক হতে পারে। মেয়েরা বিয়ের আগে বাবার গুরুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শ করে আর বিয়ের পর স্বামরি গুরু তার গুরু হয়ে যায়। কখনো কখনো ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এই গুরু নিভৃর সাধন প্রক্রিয়া সুফিবাদে যেমন আছে তেমনি থেরবাদী বৌদ্ধদের মধ্যেও ছিল। ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের মতে হিন্দু ভক্তের যেমন মুসলিম গুরু রয়েছে তেমনি মুসলমান ভক্তেরও আছে হিন্দু গুরু। তারা গুরুকে সর্বকাজের মধ্যমণি করে রাখে। তাদের মতে,

প্রকৃত স্বভাব না নিলে হবে না গুরুভজন
তবে হবে আসল করণ

অর্থাৎ গুরুকে স্বামীজ্ঞানে সমস্ত দায়-দায়িত্ব, চিন্তা-ভাবনা অহংকার তার চরণে সঁপে দিয়ে মুক্ত হওয়াটা সহজ হয়। তাদের বিশ্বাস গুরু নাম হলো একমাত্র মুক্তির পথ। যে নামে ভবযন্ত্রণা দূর হয়, মানুষ পথের দিশা পায় (বিশ্বাস, ২০১৬, আগস্ট ১৬)। তাই গেয়ে উঠে:

মানব জনম পেলাম শেষে
এবার যেন হারাইওনা দিশে
গুরু সত্য নাম ভূলে না।
ভাই বন্ধু আদি, এ জগতের সাথী
এরা কেউ হবে না সঙ্গের সাথী কাঙাল বলে
অন্তিম কালে গুরুনাম ছাড়া কেউ যাবে না পারে।

এজন্য ভগবানিযা সম্প্রদায় গুরুনিন্দাকে মহাপাপ মনে করে। তারা বলে গুরুনিন্দা অধঃগতি অর্থাৎ গুরুনিন্দা করা যেমন পাপ, তেমনি শোনাও পাপ। গুরু নিন্দা শুনলে অধঃগতি প্রাপ্ত হতে হয় বলে ভগবানিয়ারা বিশ্বাস করে। গুরুবাদী এই সম্প্রদায়ের জন্য কতগুলো অলিখিত আদেশ রয়েছে। যা গুরুকেন্দ্রিক কর্তব্যকর্ম বলেই মানতে হয় ভক্তকে। ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের সব সামাজিক কাজ গুরুকে নিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। প্রতি মাসে গুরুগৃহে ভক্তকে অবশ্যই যেতে হবে। যদি একেবারেই যৌক্তিক কোনো কারণে তা সম্ভব না হয় তাহলে বছরে দুবার অন্তত যেতেই হবে। গুরুগৃহে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতে হবে। বছরে দুবার অন্তত নিজ গৃহে গুরুকে নিয়ে ধর্মীয় উৎসব করতে হবে। গুরু প্রদত্ত কোনো তত্ত্ব কোনো মন্ত্র কোনো কাগজে লেখা যাবে না। গুরুবচন সত্য বলে জানতে হবে ও মানতে হবে। এই বিধি-নিষেধ মেনে ভক্ত তার আপন ভক্তির শতদল গুরুর পায়ে অর্পণ করে গেয়ে ওঠে-

CamScanner

জগৎ গুরু বলিয়া দুবাহু তুলিয়া
ফকির গুণ গাওরে

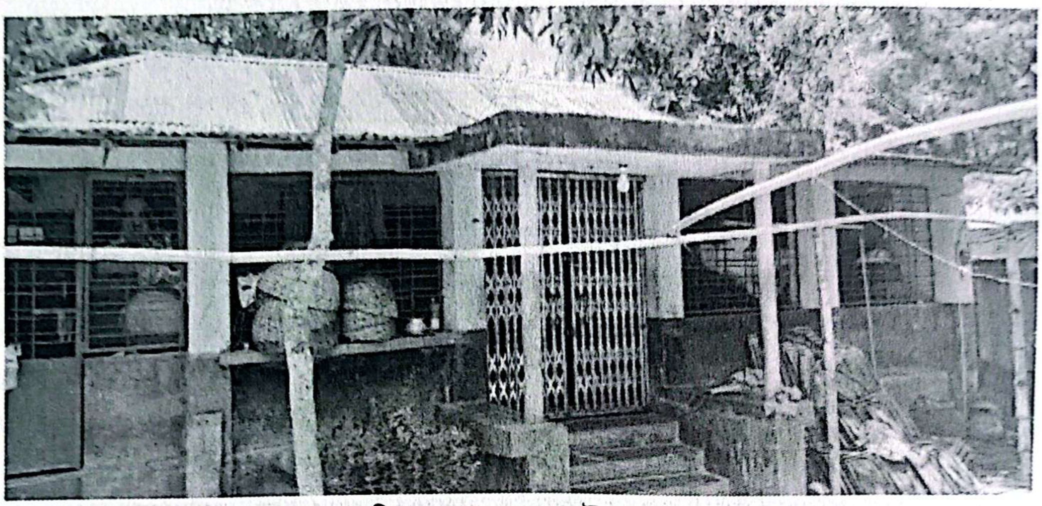

(বিশ্বাস, ২০১৬, আগস্ট ১৬)
চিত্র-১: উপাসনার উপকরণ, স্থান: সাতক্ষীরা

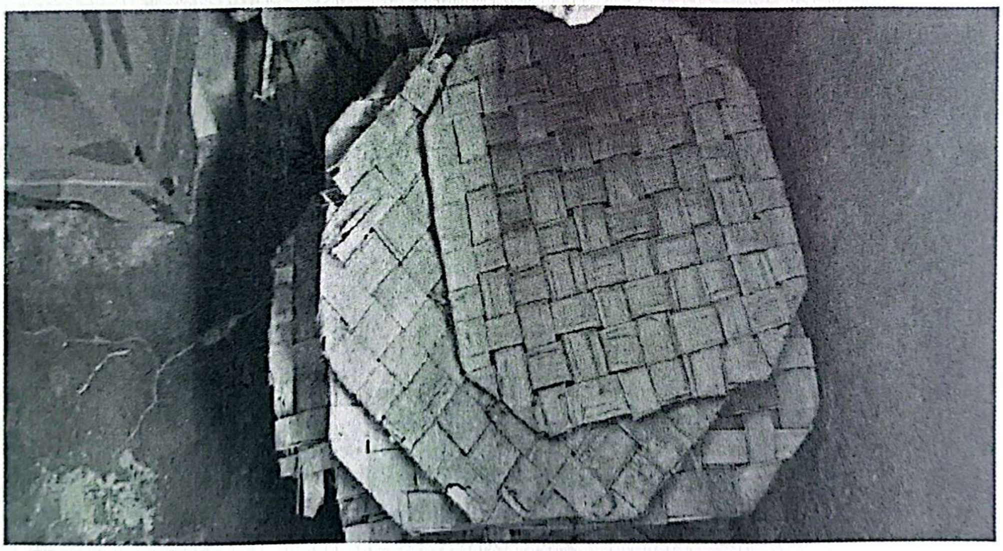

চিত্র-২: উপাসনার উপকরণ, স্থান: সাতক্ষীরা

ভক্তিবাদ

বৈষ্ণব ধর্মকেন্দ্রিক সব লোকধর্মে ভক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত। ভগবানিয়া সম্প্রদায়ও তাদের উপাসনায় ভক্তিবাদকে মোক্ষলাভের একমাত্র পথ বলে মনে করে তাই ভক্তিতে ভগবানিয়া ভক্ত গেয়ে উঠে:

ভক্তি বিনে হয় না ভজন
আর ভক্তিভাবে বিশ্বাস হলে
মিলিবে তবেমানুষ রতন।
ভক্তি বিনে হয় না ভজন
আর ভক্তি বিনে মুক্তি পথ

কবে কোথায় পেয়েছে দেখ কে কোথায় পেয়েছে
আর ভক্তি হবে মুক্তি পাবে
যার আছে একান্ত মনন।

তাদের বিশ্বাস ভক্ত যদি সেবার আয়োজন করে তাহলে ভগবান কিছুতেই সেই সেবা না গ্রহণ করে থাকতে পারে না। তবে তাদের মতে এ ভক্তি কেবল মানুষের প্রতি (বিশ্বাস, ২০১৬, আগস্ট ১৬)।

ভাবের গীত

ভগবানিয়া সম্প্রদায়ে গরু ছাড়া অন্য কোনো পশুপাখি পালন বা পোষা নিষেধ। তাদের কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। গানেই তাদের মন্ত্র ও বিশ্বাসের ব্যাখ্যা। গানের মধ্যেই তারা পেয়ে ধর্মের দর্শন-নীতি, জীবন-যাপন প্রণালী এই গানকে বলা হয় ভবের গীত বা পদের গান। প্রতি শুক্রবারে তারা গুরু বা নিজের বাড়িতে এই ভাবের গীত বা পদের গানের আসর বসায়। সেখানে চলে তাদের ধর্ম-কর্ম আলোচনা। ভক্ত গেয়ে উঠে:

মন চলরে যাই গুরুর দরবারে
সংসারে সংসেজে বন্দী রইলি কেন কারাগারে।
নির্মল গুরুর কাছাড়ি যেথায় নাইকো জুয়াচুরি
কামুকের দণ্ডভারি আইন অনুমারে।
গুরু হিংসুটের হয় যন্ত্রণা
কৃপা দণ্ড জব্দ করে।
ভেঙেছে গুরুর তবলি, করগে ভক্তির আপিল
অনুরাগে রাখো উকিল প্রেমিক জুড়ি দারে
এখন খালাস পাবি আনাহাসে
মনচলনে যাই মানুষের দেশে
নিরবধি থাকবা সুখে সদাই শান্তিপুরে।

বৈষ্ণব ধর্মের মত বেশিরভাগ পদের গানেই প্রেম ও ভক্তির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় (বিশ্বাস, ২০১৬, আগস্ট ১৬)। বিভিন্ন প্রকাশনায় দুলাল চাঁদের গীতের সংখ্যার তারতম্য রয়েছে। প্রথমত, ১৩০৬ এবং ১৩১৯ বঙ্গাব্দে ভূবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত শ্রী শ্রী যুতের পদের আখ্যা পত্রে মোট সংগীত ৬৫০। দ্বিতীয়ত, রমেশ চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ভাবের গীতের সংগীত সংখ্যা ৬১৬। তৃতীয়ত, ভূবন মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাবের গীতের সংগীত সংখ্যা ৫৮৫। চতুর্থত, মনুলাল মিশ্রের (১৩১৩) সম্পাদিত ভাবেরগীতে সংগীত সংখ্যা ৬০১। পঞ্চমত, মনুলাল মিশ্রের ভাবের গীত (১৩৫৬ পুনঃপ্রকাশ) এর সংগীত সংখ্যা ৫৯০। ষষ্ঠত, মনুলাল মিশ্রের ভাবেরগীত (১৩৫৬ পুনঃপ্রকাশ) এর সংগীত সংখ্যা ৫৭৩। সপ্তমত, মনুলার মিশ্রের ভাবেরগীত (১৩৮৪ সালে প্রকাশ) এ সংগীত সংখ্যা ৫৯০। বিভিন্ন প্রকাশনায় উল্লেখিত সংখ্যক সংগীত থেকে ধারণা করা হয় যে দুলাল চাঁদ রচিত ভাবেরগীতের সংখ্যা প্রায় ৬০০টি। (সরদার, ২০১৩, এপ্রিল ১২)

CamScanner

চিত্র-৩: উপাসনার বা ভাবের গীত, পূর্বে তালপাতায় লেখা হতো, স্থান: সাতক্ষীরা

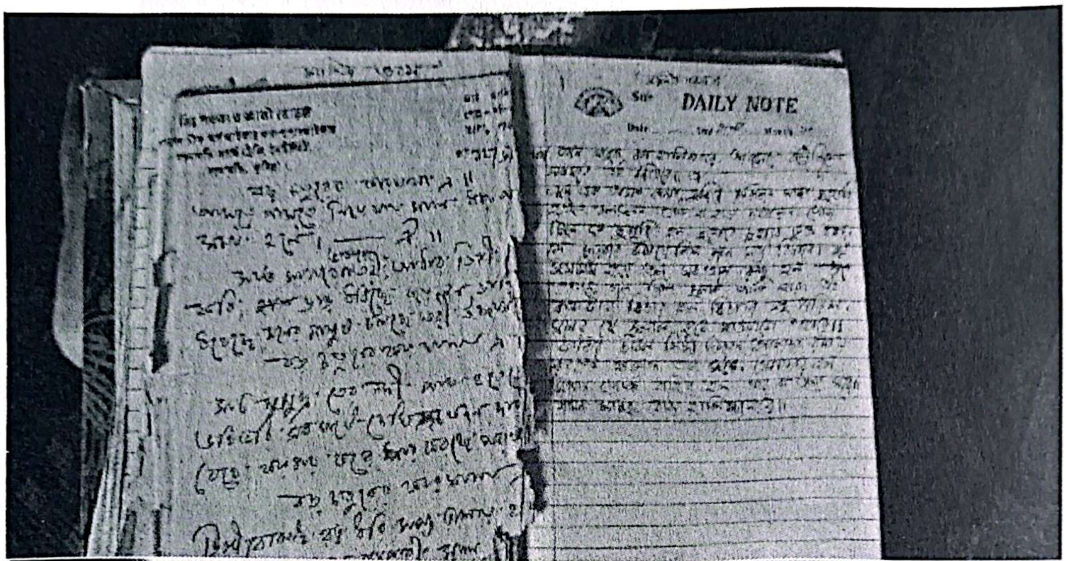

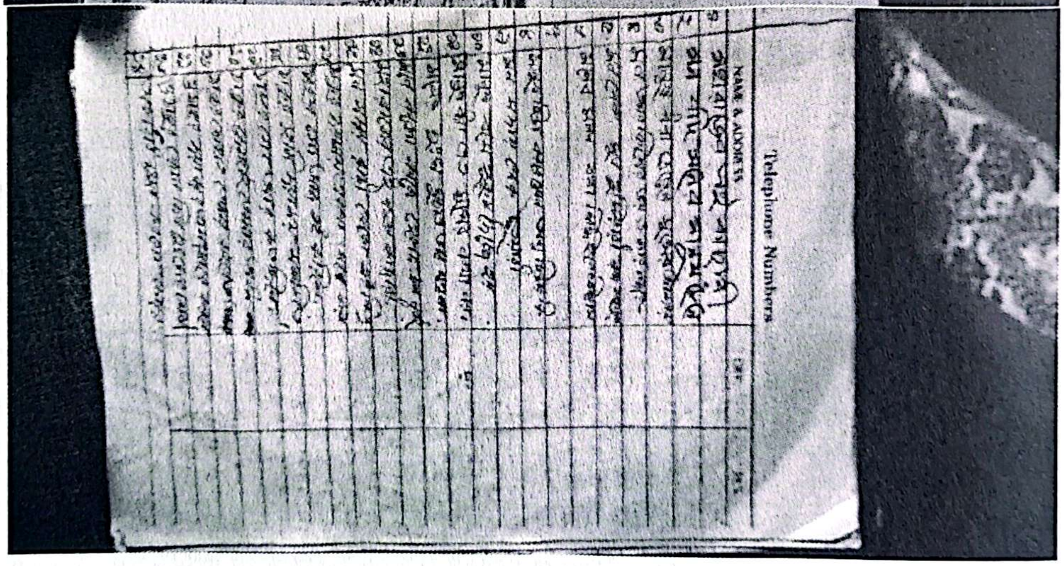

চিত্র-৪: উপাসনার বা ভাবের গীত, স্থান: সাতক্ষীরা

কর্তাভজা সম্প্রদায় তাদের ধর্মাদর্শ সংগীতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। এদের মধ্যে কর্তাভজা ভগবজ্জনেরা প্রার্থনা সংগীত ছাড়া বাকী সকল প্রকার সংগীত বাদ্যযন্ত্র সহকারে পরিবেশন করে। তবে ভগবানিয়ারা বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই সংগীত পরিবেশন করে এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে। ভগবানিয়াদের গীতের প্রায় তিন শতাধিক গীতের রচয়িতা ফকির শীবরাম ঠাকুর। এজন্য অনেকেই শীবরামের অনুসারীও বলে থাকেন। শীবরাম মহন্তের জন্মস্থান যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার জগদানন্দ কাটী গ্রামে। তিনি ঘোষ পাড়ার রামসরণ পালের ১৬০৩২ জন মহাশয়ের একজন হয়ে উঠেছিলেন। আউল চাঁদের ২২ জন প্রাথমিকাকারে দীক্ষিতদের মধ্যে একজন ছিলেন শিশুরাম কর্তাভজা। ভগবানিয়াদের মতে শিশুরামের বিবর্তিত নাম শিবরাম। তাই তাদের গীত নিয়েও বিতর্ক দেখা দেয়। তাঁদের ধর্মীয় সংগীতকে ৭ ভাগে ভাগ করা হয়- (ক) ভাবের গীত (খ) শিবরামের গীত (গ) সাধু সংগীত (ঘ) মহাজনী সংগীত (ঙ) সাহেবধনী সংগীত (চ) রামবল্লভী সংগীত (ছ) বিত্তিহুদা সংগীত (সরদার, ২০১৩, এপ্রিল ১২)।

নারী-পুরুষের অবস্থান

কর্তাভজাদের বিশ্বাস যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে নারী পুরুষের সমান অধিকার থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই পিতা-মাতাকে সর্বাঙ্গীনভবে সেবা যত্ন করবে। ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের মত বাউল ও সুফি ধর্ম গুরুবাদী ধর্ম। কিন্তু সেখানে সমন্বয়বাদের আড়ালেও পার্থক্য রয়েছে। বাউল সাধনায় নারী সহায়ক। সেখানে নারী গুরু হয়ে উঠতে পারেনি। সুফি ধর্ম, পীরবাদী ও গুরুবাদী ধর্ম সেখানেও নারী গুরু হতে পারে না। কিন্তু ভগবানিয়া বা কর্তাভজা সম্প্রদায় নারীকে দিয়েছে গুরুর মযাদা। এটি তারা হয়তো বৌদ্ধ সহজিয়া তত্ত্ব থেকে গ্রহণ করেছে। বৈষ্ণব সহজিয়ারা নারীকে রাধার অংশ মনে করতো। এই প্রাধান্য তান্ত্রিক ঐতিহ্যাশ্রয়ী। দেবী হচ্ছেন গুরু। সকল নারীই কোনো না কোনো ভাবে দেবীর গুণাবলী সম্পন্ন। যে গুরু দীক্ষা দেন তিনি দীক্ষাগুরু কৃষ্ণ। দীক্ষাগুরু যিনি অনুভব করতে শেখান তিনি হলেন রাধা। রাধার গুণাবলীতে ভাগ আছে সকল নারীর। তাই কোনোনাকোনোভাবে সকল নারীই গুরু। নারীর সীমাবদ্ধতার দেয়াল ভেঙে দিয়েছেন সমন্বয়বাদী উপধর্মগুলো। কর্তাভজা সম্প্রদায় দুলাল চাঁদের মা সতী দেবীকে কর্তা মা জ্ঞানে পূজা ও সম্মান করে।

দিলে সতী মায়ের জয় দিলে কর্তামায়ের জয়
আপদ খণ্ডে খণ্ডে কালের ভয়।
দিলে মায়ের দোহাই ঘোচে আপদ বালাই
ছুঁতে পারেনা কাল শমনে।

তাদের মতে সতী মায়ের দোহাই দিলে যে কোনো রোগবালাই দূর হয়। এভাবে সতী মায়ের অলৌকিক ক্ষমতা কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হলে সতী মা সাধ্বী রূপে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান। তাদের বিশ্বাস-

সতী মা ওপরে যেবা রাখিবে বিশ্বাস
সরে যাবে কুষ্ঠ ব্যাধি হাঁপ মুল কাশ।

বাংলাদেশে ভগবানিয়া সম্প্রদায়ও সতীমাকে মান্য করে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। তাদের মধ্যেও দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হিসেবে নারী আশীর্বাদ করেন তার ভক্তকে। ভগবানিয়া ধর্মের যতটুকু মাহাত্ম্য তার চেয়ে বেশি মহিমা দান করেছে নারীকে গুরুর মর্যাদা দানের বিষয়টি (বিশ্বাস, ২০১৬, আগস্ট ১৬)।

দেহের খাজনা প্রদান

ভগবানিয়া সম্প্রদায় ঈশ্বরকে মালিক বলে। ভক্তের দেহ ঈশ্বরের সম্পদ। তাই তাদের মধ্যে খাজনা প্রদানের রেওয়াজ রয়েছে। তাদের বিশ্বাস যেহেতু ভক্তের দেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস, তাই এর কারণ স্বরূপ মালিককে খাজনা দেওয়াই বিধেয় (বিশ্বাস, ২০১৬, আগস্ট ১৬)। এটি রাষ্ট্রীয় নিয়মে জমির কর খাজনার সাথে সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্রের জমিতে ফসল ফলানো, ঘর বানানো, প্রভৃতি কারণে সরকারকে খাজনা দিতে হয়। কর্তাভজারাও মালিকের দেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বসবাসের কারণে তাদের মহাশয় বা সরকার প্রধানের কাছে খাজনা পৌঁছে দেয়।

কারণ কর্তাভজারা মনে করে বিনা খাজনায় কারও জায়গায় বসবাস করা যায় না (সরদার, ২০১৩, এপ্রিল ১২)। তবে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বৈরোগি না হলেও সম্পদের লোভী নয়। ধর্মই তাদের দান করেছে সংযম। তারা দাস্যভাবে গুরুর সেবা করে। তাদের মতে,'মানুষের সুখের করবে মন সকলে'। মানুষই তার ঈশ্বর। মানুষের সুখের চেষ্টাতেই তার ঈশ্বর সাধনা সফল হয়। এভাবে তারা এক মহৎ মানবধর্মের চর্চা করে (বিশ্বাস, ২০১৬, আগস্ট ১৬)।

চিত্র-৫: প্রার্থনার মূহূর্ত, স্থান: সাতক্ষীরা

অসাম্প্রদায়িক ও ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি

সাম্প্রদায়িকতার মুলোটপাটন ধর্মের কাজ হলেও বর্তমান বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য খুবই কম লক্ষ করা যায়। বর্তমান সময়ে কোনো এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় ও তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই অন্য ধর্মের বিরুদ্ধচারণ ও ক্ষতি সাধনে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। সেদিক দিয়ে কর্তাভজা সম্প্রদায় ব্যতিক্রম। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনুপম দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া যায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে। এ বিষয়ে কবি নবীন চন্দ্র সেনের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তার মতে কর্তাভজা সম্প্রদায়ে কোনো জাতিভেদ নেই। সকলেই এক রন্ধন শালার পাক গ্রহন করে। স্পর্শদোষ এদের কাছে মুখ্য নয়। মানুষ হয়ে বর্বরতার ভূমিকায় থাকা যাবেনা-এটাই এদের কাছে মুখ্য বিবেচ্য বিষয়।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আচার ও কৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রদায়ভুক্ত নবজাতকের নাম রাখার ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের নামকরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আর সে কারণেই পিতার নাম ইসমাইল হলেও ছেলের নামে গোবিন্দ নাম করণে কোন বাঁধা থাকেনা এ সম্প্রদায়ে। অন্যদিকে এক মেয়ের নাম আয়েশা ও অন্য মেয়ের নাম পূর্ণিমা রাখতেও বাঁধা নেই। ছেলে স্কুলে কুরআন পড়লেও মেয়ে দিব্যি গীতা পাঠে কোনো বাঁধা নেই (সরদার, ২০১৩, পৃ. ১০)। এ সম্প্রদায়ে বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটে নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে। অন্য ধর্মের ছেলে-মেয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ। যদি কখনো বিপরীত কোনো ধর্মের ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তবে বিপরীত ধর্মের ছেলে মেয়েকে ভগবেনে ধর্মে দীক্ষিত হতে হয়। তবে হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী বিবাহের অনুষ্ঠানাদি পালিত হয় (কিনুলাল, সাক্ষাৎকার, ১৬ আগস্ট ২০১৭)।

CamScanner

আবার এই সম্প্রদায়ে দেহ রক্ষার পরে লাশ মুসলিম কায়দায় দাফন করে। কেউ বা আবার শ্মশানে নিয়ে দাহ করে। বিবাহিত রমনীরা কেউ হাতে শাখা ও মাথায় সিঁদুর পরে আবার কেউ এসবের কিছুই করেনা। এই সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য দিক হল- এখানে হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্যের পাশাপাশি মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্যও রয়েছে (অজিত খাঁ, সাক্ষাৎকার, ১৫ আগস্ট ২০১৭)। আবার বাউল সম্প্রদায়ের মত একইভাবে এরা জাতিভেদ প্রথা মানেনা। দুলাল চাঁদের ভাবের গীতে তাই বলা হয়েছে-

'ভেদ নাই মানুষে মানুষে
খেদ কেন ভাই এদেশে"॥

চিত্র-৬: মুসলমানদের মত মৃতের কবর, স্থান: সাতক্ষীরা

গুরুদেব নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্তাভজারা বর্ণবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের নিগড় থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। গুরুরদেবের পুত্র অযোগ্য হলে তারা তাকে গুরু নির্বাচন না করে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধন ভজন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিকেই গুরুদেব নির্বাচন করে থাকে। কর্তাভজা সম্প্রদায়ীরা মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব- ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, হিন্দুধর্মের প্রচলিত ধর্মীয় উৎসব-দুর্গাপুজা, বৌদ্ধদের জন্মাষ্টমী, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, খ্রিষ্টানদের বড়দিন- প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। এ যেন 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'- এই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ।

গীতের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক ও সমতার চেতনার প্রসার

"কর্তাভজা ধর্ম সম্প্রদায়ে মূলত সব মানুষকে সমান জ্ঞান করা হয়। সমতার এই বিধানের কারণে কুমার, তাঁতি, জেলে, কৃষক, মুচী, হিন্দু, মুসলমান, মগ, ফিরিঙ্গী, ওলন্দাজ, ব্রাহ্মণ সহ সকল স্তরের মানুষ এই ধর্মের ছায়াতলে এস দীক্ষা নেয়। পাগল চাঁদ ঠাকুর ভাবের গীত থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন

দেখ মগ ফিরিঙ্গি ওলন্দাজ হিন্দু মুসলমান
এক বিধাতায় গড়েছে
বস্তু তাই আছে সব দেহে
দেখ ছত্রিশ বর্ন সকলকে মানুষ বলে কয়
জীবন চলাচলের বিধি-বিধান গীতের মাধ্যমে জানা যায়।
গ্রন্থকারে লিখলে ধরে মানুষ একটি হয়।
(ঠাকুর, ২০১০, পৃ. ৬১)

ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের জাত-পাতের কারণে সৃষ্ট তীব্র অসন্তোষ থেকে বেরিয়ে এসে কর্তাভজা সম্প্রদায়ীগন ব্রাহ্মণদের বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গীতের মাধ্যমে তাদের সাম্যের অবস্থান জানান দিত। প্রাসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য গীত -

বেদে না জানে তারে, বেদ বিধির অগোচরে,
আসিয়ে এই সংসারে বসলেন হালিশ্বর
এবার সে ৩৬ বর্ণের ডান গুচাইয়ে
করতেছেন সে একাকার।
(সরদার, ২০১৩ পৃ. ২১)

আঠারো শতকে যতগুলো উপধর্ম সৃষ্টি হয়েছিলো তার প্রায় সমন্বয়বাদী সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পার্থক্য কেবল বহিরাঙ্গে। মানসিকতায় তারা প্রায় এক। ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের দিকে তাকালে দেখা যায় সমন্বয়বাদের চমৎকার মেলবন্ধন। বিয়ের সংস্কৃতিতে হিন্দুয়ানা, মৃত্যুর সংস্কৃতিতে ইসলামী পন্থা অবলম্বন করে এই সম্প্রদায় উদার মানসিকতা বহন করছে বহিরাঙ্গে। এছাড়া ভগবানিয়া সম্প্রদায় তাদের ধর্ম বা সম্প্রদায় কেন্দ্রিক কোনো নির্দিষ্ট বেশভূষা পরিধান করা, শরীরে কোনো চিহ্ন অথবা তুলসি মালা, রুদ্রাক্ষমালা, তিলক, তীরশূল প্রভৃতি করাকে গ্রহিত মনে করে। তারা মনে করে এগুলো মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ সৃষ্টি করে। তারা মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ সৃষ্টি করে না। তাই তাদের নির্দিষ্ট কোনো পোশাক বা চিহ্ন নেই (বিশ্বাস, ২০১৬, আগস্ট ১৬)। কর্তাভজা সম্প্রদায়ে মূর্তিপূজা ও সকল প্রকার আনুষ্ঠানিক যাগজজ্ঞের বিরোধী। মানবসেবাই তাদের কাছে মুখ্য। এ প্রসঙ্গে কর্তাভজা প্রচার দুলাল চাঁদ রচিত ভাবের গীতে উল্লেখ আছে-

আছে মানুষে মানুষে যার ভেদাভেদ জ্ঞান,
সে রাজ্য গমণে তার মিলিবে না সন্ধান
কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মানবসেবাই মূল ধর্ম।

তাদের বিশ্বাস,

মানুষ ভজ, মানুষ চিন, মানুষ কর সার,
সকলি মানুষের খেলা মানুষ বই না আর"

উৎসব পালন

ভগবানিয়াদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র মাসের শেষ দিনে। এই অনুষ্ঠান তিন দিন ধরে চলে। এ ছাড়া প্রতি মাসে একবার তারা কাছারী গৃহে সম্মিলিত প্রার্থনায় মিলিত হন। ভগবানিয়া পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। ধর্মমতে কোনো মানুষ ভালো কাজ না করে মৃত্যুবরণ করলে তাকে

CamScanner

আবার পুনর্জন্ম নিতে হয় (মুকুল, ২০১৫, জানুয়ারি ২৮)। ভগবানিয়া সম্প্রদায় বারো মাস মূর্তি ছাড়া বারো রকম পূজা অনুষ্ঠান করে, যার সবকিছু নিবেদন করা হয় গুরুর নামে। যেমন-বৈশাখ মাসে ভগবতী পূজা। জৈষ্ঠ্য মাসে জামাই ষষ্ঠী, আষাড় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে মনসা, ভাদ্র মাসে নবা, আশ্বিন মাসে ডাকসারান্দি, কার্তিক মাসে কালিমাস, অগ্রাহায়ণ মাসে নবান্ন, পৌষ মাসে পৌষারান্দি, মাঘ মাসে পঞ্চমী স্বরস্বতী, ফাল্গুন মাসে গোসারান্দি, চৈত্র মাসে দোল পূর্ণিমা। ভগবানিয়া সম্প্রদায় ইসলামাচার পালন করলেও খৎনা প্রথার প্রচলন তাদের মধ্যে নেই (বিশ্বাস, ২০১৬, আগস্ট ১৬)। এ সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের নিজস্ব উৎসব অনুষ্ঠান যেমন রথ, উৎসব, দোল উৎসব এবং ভগবানিয়াদের মাসিক উৎসবে অংশ নেয়। কর্তাভজা ভগবানিয়াদের দু'টি উল্লেখযোগ্য বড় উৎসব হলো চৈত্র মাসের মহোৎসব এবং কার্তিক মাসে শিবরাম মহন্তের বসতবাটীতে রাশ পূর্ণিমার উৎসব। এছাড়া প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিনে ফকির আউল চাঁদ স্মরণে তার কাঁথার সমাধি স্থল বোয়ালিয়াতে উৎসব হয়। তবে একটি কথা সুস্পষ্ট যে কর্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত কোন উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন বহুদেবতায় বিশ্বাস করেনা। বহুদেবতার আরাধনা তাদের কাছে শাস্ত্র পরিপন্থী (সরদার, ২০১৩, এপ্রিল ১২)।

জীবন রীতি

এই ধর্মের অনুসারীদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরনের নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়, যেগুলো আবার স্বাস্থ্য পরিচর্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় মহিলাদের গোয়ালঘরে যাওয়া, ধানের গোলা ও সন্ধ্যা প্রদীপ স্পর্শ, বৃক্ষরোপণ ও রান্না করা নিষিদ্ধ। এমনকি শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানো ও স্পর্শ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যে নারী শিশু জন্মের পর নাভির নাড়ি কেটে ফেলে তাকে অন্য চোখে দেখা হয়, এমনকি তার হাতে রান্না করা খাবার পর্যন্ত কেউ খায় না। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা উত্তর দিক সম্মুখ (রাজপুতা) করে ঘর তৈরি করে, যাতে সহজে আলো বাতাস চলাচল করে। দক্ষিণ দিকে থাকে রান্নাঘর। দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে গোয়ালঘর তৈরি করা হয়। গুরুদেব প্রতিটি ঘর তৈরির কাজ উদ্বোধন করে থাকেন এবং বিশেষ প্রার্থনা করেন। ইট পাথরের পরিবর্তে মাটির তৈরি বাড়ি তাদের বেশ পছন্দ। জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য বাড়ির চারপাশে রোপণ করা হয় নিমগাছ। বাড়ির সামনে থাকে তুলসীগাছ। সপ্তাহে অন্তত দু-তিন দিন গোবর দিয়ে উঠান লেপন করা হয়। সন্তান বড় হলে মূল ঘরের পাশে বারান্দা তৈরি করে আলাদাভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আর্থিকভাবে সেটা সম্ভব না হলে মূল ঘরের ভেতর পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করা হয় (মুকুল, ২০১৫, জানুয়ারি ২৮)।

কোনো শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন অভিভাবক ভবের গীত গায়। নবজাতকের মা-ই তাঁকে সর্বপ্রথম দিক্ষা দেয়। শিশুর কানে মা 'সত্যমন্ত্র' বা 'গুরুমন্ত্র' পাঠ করে ফুঁ দিয়ে থাকেন। ৭ দিনের মধ্যে নাম রাখার বিধান রাখা হয়েছে। এসময় ৭ রকম শাক দিয়ে মায়ের ভাত খাবার রীতি রয়েছে। মাংস ও ডিম উত্তেজক আমিষ জাতীয় খাবারের তালিকাভুক্ত হওয়ায় এই সম্প্রদায়ীরা তা ভক্ষণ থেকে বিরত থাকে। পাশাপাশি রসুন ও পেঁয়াজও নিষিদ্ধ এ ধর্মে। মাংস নিষিদ্ধ হওয়ায় প্রাণীর শরীর থকে তৈরি চামড়ার জুতা, ব্যাগ ও বেল্ট পর্যন্ত ও তারা ব্যবহার করে না। চামড়া থেকে উৎপন্ন দ্রব্য জাত ব্যবহারে রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই মূলত এর ব্যবহার থেকে দূরে থাকত তারা। নলকূপের সিটবেল্ট চামড়া থেকে তৈরী হওয়ায় তারা ইন্দিরার (কুয়োর) পানি ব্যবহার করত। পরবর্তীতে প্লাস্টিকের সিটবেল্টের প্রচলন হওয়ায় নলকুপের পানি খাওয়া শুরু হয়।

CamScanner

তবে মশুর ডাল ও মাছ শুক্রবারে নিষিদ্ধ। জীব-জগত সৃষ্টির প্রথম দিন ও এই ধর্ম প্রচারের প্রথম দিন হিসেবে শুক্রবারের আলাদা মর্যাদা আছে। একারণে এদিন সকল প্রকার আমিষ থেকে দূরে থাকে এ সম্প্রদায়ীরা। শুক্রবার তাই সংযম দিবস হিসেবে পালিত হয়। এদিন আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ থেকে শুরু করে স্ত্রী সম্ভোগ থেকেও বিরত থাকা হয়। (অজিত খাঁ, সাক্ষাৎকার, ১৫ আগস্ট ২০১৭)

চিত্র-৮: পানির কুয়ো, স্থান: সাতক্ষীরা

তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এই ধর্ম সম্প্রদায়ীরা খুব সচেতন। উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ এখানে একেবারেই নিষিদ্ধ। খাদ্য গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের এত বেশি সচেতনতার কারণেই বিভিন্ন মরণব্যাধিতে তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা আক্রান্ত হয়না বলেই তাদের বিশ্বাস। যদি কেউ কোনো অপরাধ করে তাহলে তাকে সংশোধন করার লক্ষ্যে প্রথমে সমাজচ্যুত করে রাখা হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাকে অংশ নিতে দেওয়া হয়না। সংশোধনের জন্য তাকে কয়েকটি শর্ত দেওয়া হয়। যার মধ্যে অপরাধ করার কারণ জানতে চাওয়া হয়ে থাকে। অপরাধের সঠিক কারণ দর্শিয়ে যদি ভবিষ্যতে এগুলো আর না করার অঙ্গীকার করে তখন আবার তাকে সমাজে গ্রহণ করা হয় (কিনুলাল, সাক্ষাৎকার, ১৬ আগস্ট ২০১৭)।

নবজাতক জন্ম গ্রহণের পরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা হয়। এ সময় নবজাতকের মঙ্গলের জন্য ভবেরগীত গাওয়া হয়। এ সম্প্রদায়ের কেউ মৃত্যুবরণ করলে কিছু আলাদা রীতি পালন করা হয়। মুমূর্ষু অবস্থায় ও মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তিকে ঠাকুরের নাম শোনানো হয়। গুরুর অনুমতি নিয়ে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো হয়। মৃত্যু ব্যক্তিকে ৩টি কাপড় পরানো হয়। পাশাপাশি গলায় একটি কাপড় দেওয়া হয়। কবরে মৃতের মাথা উত্তরদিকে থাকে। মৃত ব্যক্তির সমাধির পাশে গিয়ে গলায় বস্ত্র দিয়ে গুরু ও শিষ্যরা মালিকের দরবারে আত্মার প্রশান্তি কামনা করে। তবে মৃত্যুর পরে এই সম্প্রদায়ভুক্তদের কারোর দাফন করা হয়, কাউকে আবার সমাধিস্থ করা হয়। আবার কোথাও কোথাও পোড়ানো হয়। দাফন করলে মাথা উত্তর দিকে দেওয়া হয়। বয়স্করা মারা গেলে ৪টি কালের জন্য ৪টি অনুষ্ঠান করা হয়। ১. চারেমি (চতুর্থ দিনে) ২. দশা (১০ম দিনে): মৃত ব্যক্তি ১০ ইন্দ্রিয়মিলে জীবিত থাকা অবস্থায় যে অন্যায় করেছে তার জন্য মালিকের কাছে ক্ষমা চাওয়া ৩. বিশের অনুষ্ঠান (২০তম দিনে): যৌবন ও সংসার জীবনে যত লোভ লালসা ছিল তার জন্য ক্ষমা চাওয়া। ৪. চল্লিশা (৪০তম দিনে): সবাই মিলে গুরুর কাছে আকুতি জানালে গুরু তখন বলে তোমাদের প্রার্থনা তো করলে, তবে তাকে জানাও তিনি ক্ষমা করলেও করতে পারে। গুরুদেবকে এ সময় নতুন বস্ত্র দেওয়া হয় (আরিজুল্লাহ শেখ, সাক্ষাৎকার, ১৬ আগস্ট ২০১৭)। ধর্মীয় প্রার্থনা গৃহের নাম কাচারি। দৈনন্দিন প্রার্থনা বাড়িতেও করা যায়। যোগাসন এর মত বসে

গলায় বস্ত্র দিয়ে প্রার্থনা করা যায়। বাংলা মাসের শেষের আগের দিন কাচারি ঘরে প্রার্থনা করা হয়। সন্ধ্যা থেকে রাত্র ৮টা পর্যন্ত প্রার্থনা চলে। গুরুর বাড়ির দিকে ফিরে প্রার্থনা করতে হয় (আরিজুল্লাহ শেখ, সাক্ষাতকার, ১৬ আগস্ট ২০১৭)।

চিকিৎসা পদ্ধতির ধরণ ও ফলাফল

ধর্মীয় বিশ্বাসে ব্যতিক্রমী নীতিমালার পাশাপাশি লোকায়ত স্বাস্থ্য পরিচর্যার সাথে এই ধর্ম সম্প্রদায়ের একটি যোগসূত্র রয়েছে। ধর্মের প্রচলিত বিধানচ্যুত হলেই অনুসারীরা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় বলেই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। নতুন নতুন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া আধুনিক ঔষধপত্র গ্রহণের ফল বলে মনে করেন এই সম্প্রদায় বিশ্বাসীরা। আধুনিক ঔষধ ব্যবহারের পরিবর্তে তাই ভেষজ ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উত্তম মনে করেন তারা। মাঠ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে জানা সম্ভব হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়ের লোকদের দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন-ক্যান্সার, যক্ষা, এইডস বা এ জাতীয় রোগে আক্রমণের হার খুবই কম (অজিত খাঁ, সাক্ষাৎকার, ১৫ আগস্ট ২০১৭)। ছয়টি মূলনীতির পাশাপাশি লোকায়ত স্বাস্থ্য পরিচর্যা তাদের ধর্মের একটি অংশ। যেকোনো রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায় পুরাপুরি স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল। এই সম্প্রদায় অনুসারীগণের ধারণা রোগের চিকিৎসা অনর্থক, অনেকের কাছে পাপের শামিল। কেননা, তাদের দৃষ্টিতে রোগ আসে পাপ থেকে; তাই পাপ মোচনই রোগ মুক্তির একমাত্র উপায়। এ ধর্ম অনুসারীরা কোনো রোগে আক্রান্ত হলে তাকে গুরুর সামনে উপস্থিত করা হয়। রোগীর উপস্থিতিতে একটি বৈঠকে গুরু তখন তাকে কি ভুল করেছে যার কারণে এই রোগ হল- এমন প্রশ্ন করেন। যদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ভুলটি স্বীকার করে গুরু তখন তাকে একটি বিধান দিয়ে দেন যাতে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। গুরুকে তারা বুঝে 'গুরু সত্য- আপদ মিথ্যা' (আরিজুল্লাহ শেখ, সাক্ষাৎকার, ১৬ আগস্ট ২০১৭)। আবার রোগ হওয়া মানে তাদের দৃষ্টিতে বড় কোনো ভুল করা। রোগ হলে গুরুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে রোগীকে গলায় গামছা দিয়ে গুরুর কাছে গিয়ে তদীয় পাপ স্বীকার না করলে ব্যাধি ভালো হয়না বলে তাদের ধারনা। 'দায়িত মজলিশে'' গুরুর কাছে অনুসারী ভুল স্বীকার করলে গুরু হাতে করে পানি পড়া ও উপদেশ দিলে রোগ ভাল হয়ে যায় বলে তারা মনে করেন (কিনুলাল, সাক্ষাৎকার, ১৬ আগস্ট ২০১৭)।

এর কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হলো :

- শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে লংকাবেড়ির বা গাঁদা ফুলের পাতা পিষে লাগালে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। বড় ধরনের কেটে গেলে দুটো চামড়া চেপে ধরে 'বুচ' এর পাতা চিবিয়ে কিছুক্ষণ ক্ষতস্থানে চেপে রাখলে কাটা অংশটি জুড়ে যায়। ক্ষত চিহ্নটি বোঝা যায় না।
- সাধারণ পাতলা পায়খানা হলে ভাতের মাড় বা চিড়া ভিজিয়ে লেবুর পাতা চটকিয়ে (পিষে) রোগীকে খাওয়াতে হয়। এ ছাড়া বারবার গুড়ের শরবত খাওয়াতে হয়। এরপরও যদি পায়খানা বন্ধ না হয় এবং ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হয় তবে তুলসী গাছের শিকড় বেটে রস করে খাওয়ালে উপকার হয়।
- অসহ্য পেটের ব্যথায় কিছু সরিষা, আতপ চাল ও লবণ একসঙ্গে চিবিয়ে পানি খেলে ব্যথা সেরে যায়। এ ছাড়া পাথরকুচির পাতা লবণ দিয়ে বেটে পেটের চারপাশে প্রলেপ দিলে পেট ব্যথা ভালো হয়ে যায়।
- বড়ই গাছের পাতা ও সজনের ফুল বেটে বড়ি তৈরি করে নিয়মিত খেলে গ্যাস্টিক থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়। এ ছাড়া বুচ গাছের শিকড় এবং পাতা বেটে আধা তোলা রস আধাতোলা সরিষার তেলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে গ্যাস্টিক সেরে যায়।

CS CamScanner

- ঘন ঘন প্রস্রাবে শরীর দুর্বল হয়ে পড়া। আখের চিনির সঙ্গে কুমুরকি লতার ডগা ৩-৪ টি পরপর কয়েক দিন খালিপেটে খেলে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
- আটছটি পাতার রস নিয়মিত খেলে জলবসন্ত ভালো হয়।
- মাথা যন্ত্রণায় তেলাকচুর পাতা বেটে রস করে খেতে হয়। মাথার একপাশে যন্ত্রণা করলে বুড়িপান পাতার রস সূর্য ওঠার পূর্বে মাথায় কয়েক ফোঁটা দিলে নিরাময় হয়।
- স্মরণশক্তি কমে গেলে তা বাড়াতে কুমুরকির লতার ডগা খালি পেটে কয়েক দিন খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায় (মুকুল, ২০১৫, জানুয়ারি ২৮)।

আহার গ্রহণ সম্পর্কিত কিছু আচার এই ধর্মে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- মাংস ও ডিম খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এই ধর্মে। মাংস ও ডিম উত্তেজক খাদ্য বলে তাদের বিশ্বাস। খাবার হোটেলের বাসনে মাংস ও ডিমের স্পর্শ থাকে বলে খাবার হোটেলে খাওয়ার উপরে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এ ধর্মে ছাগল-মুরগী-কবুতর পোষা নিষেধ। তবে দুধ খাবার জন্য তারা গরু লালন পালন করে থাকে। তবে লোকায়ত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করার কারণে অনেক সাধারণ গ্রামবাসী রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে তাদের পরামর্শ নেয়। যে কারণে সাধারণ গ্রামবাসীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বেশ ভালো। ভগবানিয়াদের মধ্যে শিক্ষার হার বেশ ভালো। তাদের ছেলে-মেয়েদের অনেকে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করে। তবে ধর্মের নিয়মকানুন মেনে চলা তাদের পক্ষে বেশ কাষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

বিয়ে সম্পর্কিত কিছু নিয়মনীতি

ভগবানিয়া পুরুষদের বিয়ে হয় কনের বাড়িতে। কনেকে লাল শাড়ি আর বরকে সাদা ধুতি পরতে হয়। গুরুদেবের উপস্থিতিতে বর কনেকে মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেয় এবং গুরুদেবের কিছু উপদেশের মাধ্যমে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। এরপর বর কনেকে সম্পত্তি হিসেবে এক টাকা দিয়ে থাকে। কোনো পুরুষ কোনো বিধবাকে বিয়ে করতে পারে না আর করলে তাকে সমাজচ্যুত হতে হয়। ভগবানিয়াদের যৌনজীবন খুবই সুশৃঙ্খল। সন্তান নেওয়ার উদ্দেশ্যে এমনকি সাধারণভাবেও অমাবস্যার ১৫দিন স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। তাছাড়া, শুক্রবার, শনিবার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার যৌন মিলন গ্রহণযোগ্য নয় বলে ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারীরা মনে করে। ভরাপেটে দিনের বেলা, সংকীর্ণ জায়গায় অথবা স্বল্প আলোয় (ডিম লাইটে) যৌনমিলন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। মহিলাদের গর্ভবতী হওয়ার প্রথম তিন মাস ও সন্তান প্রসবের পরবর্তী তিন মাস যৌনমিলন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

এই ধর্মমত অনুসারে মাংস ছাড়াও শোল মাছ, বোয়াল মাছ, গজার মাছ ও মসুর ডাল খাওয়া নিষিদ্ধ। একসময় তারা পেঁয়াজ ও রসুন খেত না। কিন্তু বর্তমানে গুরুদেবদের সম্মতিক্রমে পেঁয়াজ ও রসুন খেয়ে থাকে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন তারা নিরামিষ খাবার খেয়ে থাকে এবং এই সময় তাদের খাবার হচ্ছে রুটি ও ফল। তারা কখনো জুতা পায়ে রান্নাঘরে প্রবেশ ও খাবার পরিবেশন করে না। গুরুদেবকে না খাইয়ে তারা কোনো ঋতুভিত্তিক ফল খায় না। বিধবাদের আমিষযুক্ত খাবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেউ মারা গেলে পরিবারের লোকেরা তিন দিন মাছ খায় না। ভগবানিয়ারা অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের বাড়িতে কোনো খাবার খায় না অসুস্থ হওয়ার ভয়ে। তাদের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য পৃথক থালা-বাটি ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র থাকে। যদি কোনো অনুষ্ঠানে ৫০০ লোক উপস্থিত থাকে তাহলে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য। ধর্ম অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের প্রথম দিন চুল ছাঁটানো, শেভ হওয়া, মাথায় তেল ব্যবহার ও আমিষ খাওয়া

CamScanner

সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। চতুর্থ দিনে চুল ছেঁটে বা শেভ হয়ে গোসল করে পরিচ্ছন্ন হতে হয়। ঐ দিন মাটি দিয়ে ঘর এবং গোবর দিয়ে উঠান লেপন করা হয়। পাশাপাশি ঐ দিন ঘরের সমস্ত কাপড়চোপড় ও বিছানাপত্র সাবান বা সোডা দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয় এবং মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্রগুলো ফেলে দেওয়া হয়। চতুর্থ দিনে মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী লোকদের উপস্থিতিতে ধর্মীয় সংগীত গাওয়া হয়। দশম দিনে গুরুদেবের উদ্যোগে মৃত ব্যক্তির জন্য দশদশার আয়োজন করা হয় এবং ১২তম দিনে মৃত ব্যক্তির পাপমুক্তির জন্য 'বিসার কাজ' অনুষ্ঠান পালন করা হয় (মুকুল, ২০১৫, জানুয়ারি ২৮)।

অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক

ভগবানিয়াদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন অসংখ্য নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলায় আবদ্ধ থাকার কারণে পার্শ্ববর্তী প্রভাবশালী মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক সবসময় ভালো যায় না। তাছাড়া, আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। বাড়ির পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ভগবানিয়ারা কোনোভাবেই হাঁস-মুরগি ও ছাগল পালন করে না। অনেক সময় প্রতিবেশীদের হাঁস-মুরগি ও ছাগল তাদের বাড়িতে প্রবেশ করলে তারা বিরক্ত বোধ করে। যেকারণে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক সব সময় ভালো যায় না (মুকুল, ২০১৫, জানুয়ারি ২৮)। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সদস্যদের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো অদ্যবধি এরা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার শিকার হয়নি। কেন হয়নি এমন প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় 'সর্ব জায়গায় বর্ষে জল নীচু গিয়ে রয়' এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এমনটি হয়নি বলে তাদের বিশ্বাস।

বাংলা ভূখন্ডে বাংলা ভাষায় প্রচারিত ও প্রসারিত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে যারা এসেছিলেন তারা হলেন বিশপ উইলসন, রেভারেন্ড ডিয়ার ডাফ সাহেব প্রমুখ। রাম কৃষ্ণ পরমহংস দেব, রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ফকির লালন শাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সাথে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সংযোগ সাধনের কথা জানা যায়। তাতে মনে হয় কর্তাভজা সম্প্রদায় একটি মানবতাবাদী চেতনা। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ চেতনা অনেকটা নির্লীপ্ত। একারণে কর্তাভজা আন্দোলন আজ অনেকটা মৃত প্রায়। কিন্তু মানবতাবাদীরা মনে রাখবে তাদের অমর কথা "বেদ বিধি পূজা আদি সব রাখ তুলে, অন্তরকে খাঁটি কর হিংসাকে ভুলে" (সরদার, ২০১৩, এপ্রিল ১২)।

উপসংহার

কর্তাভজা সম্প্রদায় এ অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি প্রতিবাদী উপধর্মীয় সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ীরা মূলত গুরুবাদী চেতনা বিশ্বাস করে ও সে অনুযায়ী তাদের জীবনধারা পরিচালনা করে। তবে অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ীদের থেকে তাদের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। সনাতন ও ইসলাম- এই দুই ধর্মের অন্ত্যজ শ্রেণির অনুসারীদের উপস্থিতি এই সম্প্রদায়ে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রধান এই দুটি ধর্ম গোষ্ঠীতে থাকা অবস্থায় তাদের প্রতি যে ধরনের বৈষম্য বিদ্যমান ছিল সেগুলোকে একেবারে বাদ দিয়ে বৈষম্যহীন, ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও উদার গণতান্ত্রিক নীতিমালার ভাবাদর্শের সমাজ নির্মাণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় এই সম্প্রদায়ে। সামগ্রিক আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি উঁচু-নীচু-জাত-পাত প্রথায় বিভক্ত মানবজাতির সামনে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে কর্তাভজা সম্প্রদায় মানব ধর্মের চেতনাকে উদ্ভাসিত করেছে।

CamScanner

উঁচু, নিচু, জাত-পাত প্রথা, বর্ণবৈষম্য ও খন্ড-বিখন্ড মানব জাতিকে মানব ধর্মের চেতনায় উদ্ভাসিত করাই ছিল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অভিষ্ট লক্ষ্য। তবে কিছু কিছু বিধি-নিষেধ জীবন চলার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন- কারো এঁটো খাওয়া নিষেধ থাকার কারণে তাদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে অনেক বাঁধাপ্রাপ্ত হতে হয়। অনেকে উচ্চ শিক্ষা থেকে বিরত থেকেছেন যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ পর্যায়ে ছাত্রাবাসে বা যেকোনো খাবার হোটেলে তাদের খাবার গ্রহণ করতে হবে। তবে অনেকেই এখন এই রীতি থেকে বের হয়ে এসেছেন, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং করছেন বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরে।

তথ্যসূত্র

ইসলাম, সিরাজুল, বাংলাপিডিয়া (২০১১)। খণ্ড: ১২, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

খান, বেনজিন (২০১৯) *ভগমেনে ধর্ম ও তাদের কথা*, যশোর।

খালেকুজ্জামান, বদরু মোহাম্মাদ (২০১৬)। *তালা উপজেলার ইতিহাস ঐতিহ্য*, ঢাকা: প্রতিভা প্রকাশ।

ঠাকুর, পাগল চাঁদ (২০০৫)। *কর্তাভজা সম্প্রদায় ও সত্যদর্শন*, যশোর: মিলনতীর্থ।

নন্দী, রতন কুমার (২০১১)। *কর্তাভজা ধর্ম ও সাহিত্য*, কলকাতা: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্বাস, রঞ্জনা (২০১৬, আগস্ট ১৬)। *ভগবানিয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম ও দর্শন*, চিন্তাসূত্র: শিল্প, কলকাতা: সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওয়েবম্যাপ। https://www.chintasutra.com/article.

মিত্র, সতীশচন্দ্র, (২০০১), যশোহর খুলনার ইতিহাস, কলকাতা: দেজ পাবলিকেশন্স।

মুকুল, মনজুরুল আলম, (২০১৫, জানুয়ারি ২৮)। *ধর্মের নাম কর্তাভজা*, ঢাকা: রাইজিং বিডি।

রহমান, শেখ মাসুদুর (২০১৫)। *ওষধি বিজ্ঞান ও ভগবানিয়া সম্প্রদায়*।

সরদার, গোপাল চন্দ্র (২০১৩, এপ্রিল ১২)। *কর্তাভজা সম্প্রদায়: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিডিং ক্লাব (ডিইউআরসি)। https://durcbd.wordpress.com

সরদার, গোপাল চন্দ্র (২০১৩)। *বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতিতে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অবদান*, এমফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূত্রধর, বাবুল চন্দ্র (২০১৩)। *'সাম্য-সংস্কৃতি'*, সিদ্ধিঃ শ্রী শ্রী গনেশ পূজা, ঢাকা: গণপতি পূজা উদযাপন পরিষদ।

Parthib, Sukanta, *Lalon Shai: The Guru of Humanity*, The Daily Star, October 16, 2017.

সাক্ষাৎকার গ্রহণ:

অজিত খাঁ (৫০), গুরুমার পূত্র। চরগ্রাম, তালা, সাতক্ষীরা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৫/০৮/২০১৭।

আরিজুল্লাহ শেখ (৬০), চরগ্রাম, তালা সাতক্ষীরা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৬/০৮/২০১৭।

ওয়াজেদ মণ্ডল (৬০), কাশিয়াডাঙ্গা, তালা, সাতক্ষীরা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৪/০৮/২০১৭।

কিনুলাল গাইন (৬০) এডভোকেট, সাতক্ষীরা জজ কোর্ট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৬/০৮/২০১৭

গোপাল চন্দ্র সরদার (৪৫), উপাধ্যক্ষ, ঝাউডাঙ্গা কলেজ, সাতক্ষীরা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৬/০৮/২০১৭

বেনজিন খান (৬০), পরিচালক, প্রাচ্য সংঘ, যশোর। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৬/০৮/২০১৭।

ভুট্ট লাল গাইন (৫৫), চেয়ারম্যান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৬/০৮/২০১৭

সাগর হোসেন (২৫), ছগ্রাম, তালা, সাতক্ষীরা। শিক্ষার্থী, কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিং। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৬/০৮/২০১৭

CamScanner